চিরায়ত বই

১২

পঞ্চগ্রাম

পঞ্চগ্রাম

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চগ্রাম
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২২

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল
বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ৪০০ টাকা

Panchagram a novel by Tarasankar Bandyopadhyay Published by
Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: December 2022
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US$ 20
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96871-4-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাভাজন
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীচরণেষু

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার লাভপুরে, ১৮৯৮ সালের ২৩ জুলাই। কলেজ ছেড়ে মহাত্মা গান্ধির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দান। কারাবরণ করেছেন একাধিকবার। আজীবন কংগ্রেসি রাজনীতিতে আস্থাশীল, ছিলেন আইন প্রণেতাও। বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক। লিখেছেন ৬৫টি উপন্যাস, ৫৩টি ছোটগল্প-সংকলন, ১২টি নাটক, ৪টি প্রবন্ধ-সংকলন, ৪টি স্মৃতিকথা, ২টি ভ্রমণকাহিনি, ১টি কাব্যগ্রন্থ এবং ১টি প্রহসন।

আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসের জন্য ১৯৫৫ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' ও ১৯৫৬ সালে 'সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার' পান। ১৯৬৭ সালে *গণদেবতা* উপন্যাসের জন্য 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার'। ১৯৬২ সালে 'পদ্মশ্রী', ১৯৬৮ সালে 'পদ্মভূষণ' সম্মানেও বিভূষিত হন তিনি। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'শরৎস্মৃতি পুরস্কার' (১৯৪৭) ও 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' (১৯৫৬)-এ সম্মানিত। তাঁর চল্লিশটি রচনা চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। যাদের অন্যতম *সপ্তপদী*, *দুই পুরুষ*, *গণদেবতা*, *আরোগ্য নিকেতন*, *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*, *অভিযান* ও *জলসাঘর*।

রাঢ়ের মানুষের জীবনচিত্র, ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম, মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বে পুঁজির বিজয়– সর্বোপরি নবভারত ছিল তারাশঙ্করের সাহিত্য সাধনার মূল বিষয়বস্তু।

দাম্পত্যসঙ্গী : উমাশশী দেবী। মৃত্যু : ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালে।

এক

আষাঢ় মাস। শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা পর্ব; দ্বাদশ মাসে বিষ্ণুর দ্বাদশ যাত্রার মধ্যে আষাঢ়ে রথযাত্রা হিন্দুর সর্বজনীন উৎসব। পুরীতে জগন্নাথ-বিগ্রহের রথযাত্রাই ভারতবর্ষে প্রধান রথযাত্রা। সেখানেও আজ জগন্নাথ-বিগ্রহ জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের ঠাকুর; অবশ্য এ জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষত্ব কেবল হিন্দু-ধর্মাবলম্বীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ; হিন্দুদের সকলেই আজ রথের দড়ি স্পর্শ করিয়া জগন্নাথ-বিগ্রহের স্পর্শ-পুণ্যলাভের অধিকারী। জগন্নাথ-বিগ্রহ কাঙালের ঠাকুর।

পুরীর রথযাত্রা প্রধান রথযাত্রা হইলেও, হিন্দু-সমাজের সর্বত্র বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের প্রায় গ্রামে গ্রামেই ক্ষুদ্র বৃহৎ আকারে রথযাত্রার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উচ্চবর্ণের হিন্দু-গৃহে আজ জগন্নাথদেবের উদ্দেশে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতের সহযোগে পায়সান্নের বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হইবে। আম-কাঁঠালের সময়, আম-কাঁঠাল ভোগের একটি অপরিহার্য উপকরণ। ধনী জমিদারদের অনেকেরই ঘরে প্রতিষ্ঠিত রথ আছে; কাঠের রথ, পিতলের রথ। এই রথে শালগ্রাম-শিলা অথবা প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহমূর্তিকে অধিষ্ঠিত করিয়া পুরীর অনুকরণে রথ টানা হয়। বৈষ্ণবদের মঠে রথযাত্রা উপলক্ষে মহোৎসব সংকীর্তন হয়, মেলা বসিয়া থাকে। বাংলার চাষিদের অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্মাশ্রয়ী, তাহারা এই পর্বটি বিশেষ আগ্রহে পালন করে; হলকর্ষণ নিষিদ্ধ করিয়া তাহারা পর্বটিকে আপনাদের জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া লইয়াছে। দু-দশখানা গ্রাম অন্তর অবস্থাপন্ন—চাষিপ্রধান গ্রামে বাঁশ-কাঠ দিয়া প্রতি বৎসর নূতন রথ তৈয়ারি করিয়া পর্বের সঙ্গে উৎসব করে। ছোটখাটো মেলা বসে। আশপাশের লোকজন ভিড় করিয়া আসে। কাগজের ফুল, রঙিন কাগজে মোড়া বাঁশি, কাগজের ঘূর্ণিফুল, তালপাতার তৈরি হাত-পা-নাড়া হনুমান, দুম-পটকা বাজি, তেলেভাজা পাঁপর, বেগুনি, ফুলরি ও অল্পস্বল্প মনিহারির জিনিস বিক্রি হয়।

মহাগ্রামের ন্যায়রত্নের বাড়িতে রথযাত্রার অনুষ্ঠান অনেক দিনের; ন্যায়রত্নের ঊর্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষ রথ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দন ঠাকুর রথারোহণ করেন; পাঁচচূড়াবিশিষ্ট মাঝারি আকারের কাঠের রথ। একটি মেলাও বসে। আগে মেলাটা বেশ বড় হইত। বিশেষ করিয়া লাঙলের জন্য বাবলাকাঠের টুকরা, বাবুই-ঘাসের দড়ি, তৈয়ারি দরজা-জানালা এবং কামারের সামগ্রী অর্থাৎ লোহার বড় গজাল, ফাল, কোদাল, কুড়ুল, কাটারি, হাতা, খন্তা কিনিতে কয়েকখানা গ্রামের লোকই

এখানে ভিড় করিয়া আসিত। কিন্তু এখন আর সেসব জিনিস কেনাবেচা হয় না। স্থানীয় ছুতার-কামারেরা এখন সাহস করিয়া এসব জিনিস মেলায় বিক্রির জন্য তৈয়ারি করে না। তাহাদের পুঁজির অভাবও বটে, আবার লোকে কেনে না বলিয়াও বটে। একমাত্র লাঙলের জন্য বাবলাকাঠের কেনাবেচা এখনও কিছু হয় এবং বাবুই-ঘাস এবং বাবুই—দড়িও এখনও কিছু বিক্রি হয়। তবে অন্য কেনাবেচা কম হয় না, দোকানপাটও পূর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যায় আসে, লোকের ভিড়ও বাড়িয়াছে। মাতব্বর ছাড়াও লোকজনেরা ভিড় করিয়া আসিয়া থাকে। সস্তা শৌখিন মনিহারি জিনিসের দোকান, তৈরি জামাকাপড়ের দোকান আসে, জংশনের ফজাই শেখের জুতার দোকানও আসিয়া একপাশে বসে। কেনাবেচা যাহা হয়—তাহা এইসব দোকানেই। লোকও অনেক আসে। কয়েকখানা গ্রামের মাতব্বর লোকেরা আজও সসম্ভ্রমে ন্যায়রত্নের বাড়িতে ঠাকুরের রথযাত্রা উপলক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়, রথের টানে প্রথম মাতব্বররাই দড়ি ধরিবার অধিকারী। অপর লোকের জনতা দোকানেই বেশি। এখনও তাহারা ভিড় করিয়াই আসে। পাঁপর খাইয়া, কাগজের বাঁশি বাজাইয়া, নাগরদোলায় চাপিয়া ঘুরপাক খাইয়া তাহারাই মেলা জমাইয়া দেয়।

মহাগ্রাম এককালে-একালে কেন, প্রায় সত্তর-আশি বৎসর পূর্বেও—ওই অঞ্চলের প্রধান গ্রাম ছিল। ন্যায়রত্নই এ অঞ্চলের সমাজপতি, পরম নিষ্ঠাবান পণ্ডিতবংশের উত্তরাধিকারী। এককালে ন্যায়রত্নের পূর্বপুরুষেরাই ছিলেন এখানকার পঞ্চবিংশতি গ্রাম-সমাজের বিধানদাতা। পঞ্চবিংশতি গ্রাম-সমাজ অবশ্য বর্তমানকালে কল্পনার অতীত। কিন্তু এককালে ছিল। গ্রাম হইতে পঞ্চগ্রাম, সপ্তগ্রাম, নবগ্রাম, পঞ্চবিংশতি—এমনিভাবেই গ্রাম্যসমাজের ক্রমবিস্তৃতি ছিল; বহুপূর্বে শতগ্রাম, সহস্রগ্রাম পর্যন্ত এই বন্ধনসূত্র অটুটও ছিল। তখন যাতায়াত ছিল কষ্টসাধ্য। এখন যাতায়াত সুগম হইয়াছে কিন্তু সম্পর্ক-বন্ধন বিচিত্রভাবে শিথিল হইয়া যাইতেছে। আজ অবশ্য সেসব নিতান্তই কল্পনার কথা, তবে পঞ্চগ্রাম-বন্ধন এখনও আছে। মহাগ্রাম আজ নামেই মহাগ্রাম, কেবলমাত্র ন্যায়রত্নের বংশের অস্তিত্বের লুপ্তপ্রায় প্রভাবের অবশিষ্টাংশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া মহৎ বিশেষণে কোনোমতে টিকিয়া আছে। রথযাত্রার মতই কয়েকটি পর্ব উপলক্ষে লোকে ন্যায়রত্নের টোল ও ঠাকুরবাড়িতে আসে। রথযাত্রা, দুর্গাপূজা, বাসন্তীপূজা—এই তিনটি পর্ব এখনও ন্যায়রত্নের বাড়িতে বেশ একটু সমারোহের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আজ ন্যায়রত্নের বাড়িতে রথযাত্রার উৎসব।

ন্যায়রত্ন নিজে হোম করিতেছেন। টোলের ছাত্ররা কাজকর্ম করিয়া ফিরিতেছে। কয়েকখানি গ্রামের মাতব্বররা আটচালায় শতরঞ্জির আসরে বসিয়া আছে। গ্রাম্য চৌকিদার এবং আরও কয়েকজন তামাক সাজিয়া দিতেছে। মেলার মধ্যেও লোকজনের ভিড় ধীরে ধীরে ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। একটা ঢাকী ঢাক বাজাইয়া দোকানে পয়সা মাগিয়া ফিরিতেছে।

বর্ষার আকাশে ঘনঘোর মেঘের ঘটা; শূন্যলোক যেন ভূপৃষ্ঠের নিকট স্তরে স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই-একখানা পাতলা কালো ধোঁয়ার মত মেঘ অতি দ্রুত ভাসিয়া চলিয়াছে; মনে হইতেছে সেগুলি ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী উঁচু বাঁধের বহুকালের সুদীর্ঘ তালগাছগুলির মাথা ছুঁইয়া চলিয়াছে।

ঢাকের বাজনা শূন্যলোকের মেঘস্তরের বুকে প্রতিহত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

শিবকালীপুরের দেবু ঘোষ ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ ধরিয়া দ্রুতপদে মহাগ্রামের দিকে চলিয়াছিল। ঢাকের গুরুগম্ভীর বাদ্যধ্বনি দিগন্তে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মহাগ্রামেই ঢাক বাজিতেছে। ন্যায়রত্নের বাড়িতে রথযাত্রা। এতক্ষণে ঠাকুর বোধহয় রথে চড়িলেন। রথ হয়ত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দ্রুত গতিতেই সে চলিয়াছিল, তবু সে তাহার গতি আরও দ্রুত করিবার চেষ্টা করিল।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র বিশ্বনাথ দেবুর স্কুলের বন্ধু—শুধু বন্ধু নয়, স্কুলে তাহারা ছিল পরস্পরের প্রতিযোগী। ক্লাসে কোনোবার দেবু ফার্স্ট হইত, কোনোবার হইত বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ এম. এ পড়ে। দেবু পাঠশালার পণ্ডিত। এককালে, অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুর পূর্বে, একথা মনে করিয়া তীব্র অসন্তোষের আক্ষেপে দেবু বিদ্রুপের হাসি হাসিত। কিন্তু এখন আর হাসে না—দুঃখও তাহার নাই। প্রাক্তন অথবা অদৃষ্ট অমোঘ অখণ্ডনীয় বলিয়া নয়, সে যেন এখন এসবের গণ্ডির বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল যতিনকে।

ডেটিন্যু যতীন তাহাকে দিয়া গেল অনেক। এ সমস্তকে জয় করিবার শক্তি—যতীনের সাহায্যই তাহাকে দিয়াছে। যতীনবাবু আজ এখান হইতে চলিয়া গেলেন। এই কিছুক্ষণ পূর্বে সে তাঁহাকে ময়ূরাক্ষীর ঘাট পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া বিদায় লইয়াছে। সেখান হইতে সে মহাগ্রামের দিকে আসিতেছে। তাহার শূন্য জীবনে ডেটিন্যু যতীনই ছিল একমাত্র সত্যকারের সঙ্গী। আজ সেও চলিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—এই বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন দিনটিই এই ময়ূরাক্ষীর ঘাটেই কোনো নির্জন গাছতলায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ওই ঘাটের পাশেই—ময়ূরাক্ষীর বালচুরের উপর সে তাহার খোকনকে এবং প্রিয়তমা বিলুকে ছাই করিয়া দিয়াছে। জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে—অল্পস্বল্প বৃষ্টিতে সে চিহ্ন আজও নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই; তাহার পাশ দিয়া ভিজাবালির উপর পায়ের ছাপ আঁকিয়া যতীন চলিয়া গেল। আজ যে ঘটা করিয়া মেঘ নামিয়াছে, নৈর্ঋত কোণ হইতে যে মৃদুমন্দ বাতাস বহিতে শুরু করিয়াছে, তাহাতে বর্ষার বর্ষণ নামিতে আর দেরি নাই। গ্রাম মাঠঘাট ভাসিয়া ময়ূরাক্ষীতে ঢল নামিবে—সেই ঢলের স্রোতে খোকন-বিলুর চিতার চিহ্ন, যতীনের পায়ের দাগ নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে—সেই মুছিয়া যাওয়া দেখিবার ইচ্ছা তাহার ছিল। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাড়ির আহ্বান

সে প্রত্যাখান করিতে পারে না। যতীন তাহাকে জীবনে দিয়াছে একটি সুস্পষ্ট আদর্শ আর ন্যায়রত্ন তাহার জীবনে দিয়াছেন এক পরম সান্ত্বনা। তাঁহার সে গল্প যে ভুলিবার নয়। ঠাকুরমশাই আজ তাহাকে বিশেষ করিয়া আহ্বান জানাইয়াছেন। তাহার একটি বিশেষ কারণও আছে। স্নেহ তো আছেই, কিন্তু যে কারণ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন—সেই কথাটিই দেবু ভাবিতেছিল।

সরকারি জরিপ আইন অনুযায়ী এ অঞ্চলে সেটেলমেন্ট সার্ভে হইয়া গেল। রেকর্ড অব রাইটসের ফাইনাল পাব্লিকেশনও হইয়া গিয়াছে। সেটেলমেন্টের খরচের অংশ দিয়া প্রজারা 'পরচা' লইয়াছে। এইবার জমিদারের খাজনা-বৃদ্ধির পালা। সর্বত্র সকল জমিদারই এক ধুয়া তুলিয়াছে—খাজনা বৃদ্ধি। আইনসম্মতভাবে তাহারা প্রতি দশ বৎসর অন্তর নাকি খাজনায় বৃদ্ধি পাইবার হকদার। আজ বহু দশ বৎসর পর সেটেলমেন্টের বিশেষ সুযোগে তাহারা খাজনা বৃদ্ধি করাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ফসলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে—এইটাই হইল খাজনা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। রাজসরকারের প্রতিভূস্বরূপে জমিদারের প্রাপ্য নাকি ফসলের অশং। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলে জমিদারেরা সেই প্রাপ্য ফসলের তৎকালীন মূল্যকেই টাকা-খাজনায় রূপান্তরিত করিয়াছিল। সুতরাং আজ যখন ফসলের মূল্য সেকাল হইতে বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে, তখন জমিদার বৃদ্ধি পাইবার হকদার। তা ছাড়া আরও একটা প্রকাণ্ড সুবিধা জমিদারের হইয়াছে। সেটেলমেন্ট আইনের পাঁচ ধারা অনুযায়ী স্থানে স্থানে সাময়িক আদালত বসিবে। সেখানে কেবল এই খাজনা বৃদ্ধির উচিত-অনুচিতের বিচার হইবে। অতি অল্প খরচে বৃদ্ধির মামলা দায়ের করা চলিবে—বিচারও হইবে অল্প সময়ের মধ্যে। তাই আজ ছোট বড় সমস্ত জমিদারই একসঙ্গে বৃদ্ধি-বৃদ্ধি করিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে।

প্রজারাও বসিয়া নাই; 'বৃদ্ধি দিব না' এই রব তুলিয়া তাহারাও মাতিয়া উঠিয়াছে। হ্যাঁ, 'মাতন' বইকি! যুক্তি আছে তাহাদের, তর্কও তাহারা করে। তাহারা বলে—ফসলের দাম বাড়িয়াছে সে কথা ঠিক, কিন্তু আমাদের সংসার—খরচ কত বাড়িয়াছে দেখ! জমিদার বলে—সে দেখিবার কথা আমাদের নয়; আমাদের সম্পর্ক রাজভাগ ফসলের দামের সঙ্গে। এ সূক্ষ্ম যুক্তি প্রজারা বুঝিতে পারে না—বুঝিতে চায় না। তাহারা বলিতেছে—আমরা 'দিব না'। এই 'দিব না' কথাটির মধ্যে তাহারা আস্বাদ পায় এক অদ্ভুত তৃপ্তির। একক কেহ পাওনাদারের প্রাপ্য দিব না বলিলে সমাজে সে নিন্দিত হয়, কিন্তু ওইটিই মানুষের যেন অন্তরের কথা। না দিলে আবার যখন বাড়িবে—অন্তত কমিয়া যাওয়ার দুঃখ হইতে বাঁচিব—তখন না-দিবার প্রবৃত্তিই অন্তরে জাগিয়া ওঠে। তবে একক বলিলে সমাজে নিন্দা হয়, আদালতে পাওনাদার দেনাদারের কাছে সহজেই প্রাপ্য আদায় করিয়া লয়। কিন্তু আজ যখন সমাজসুদ্ধ সকলেই দিব না রব তুলিয়াছে, তখন এ আর নিন্দার কথা কোথায়? আজ দাঁড়াইয়াছে দাবির কথা। রাজদ্বারে পাওনাদার করুক

নালিশ; কিন্তু আজ তাহারা একখানি বাঁশের কঞ্চি নয়, আজ তাহারা কঞ্চির আঁটি—মুট করিয়া অনায়াসে ভাঙিয়া যাইবার ভয় নাই। 'ভয় নাই' এই উপলব্ধির মধ্যে যে শক্তি আছে, যে মাতন আছে, সেই মাতনেই তাহারা মাতিয়া উঠিয়াছে। এখানকার প্রায় সকল গ্রামের প্রজারাই ধর্মঘট করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছে। এখন প্রয়োজন তাহাদের নেতার। প্রায় প্রতি গ্রাম হইতে দেবু নিমন্ত্রণ পাইয়াছে। তাহাদের গ্রাম শিবকালীপুরের লোকেরা তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এসব ব্যাপারে দেবুর আর নিজেকে জড়াইয়া ফেলিবার ইচ্ছা ছিল না। বারবার সে তাহাদের ফিরাইয়া দিতেই চাহিয়াছে—তবু তাহারা শুনিবে না। এদিকে মহাগ্রামের লোকে শরণাপন্ন হইয়াছিল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের। ন্যায়রত্ন পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে দেবুর কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। লিখিয়াছেন "পণ্ডিত, আমার শাস্ত্রে ইহার বিধান নাই। ভাবিয়া দেখিলাম—তুমি বিধান দিতে পার; বিবেচনা করিয়া তুমি ইহার বিধান দিয়ো।

আজ এই রথযাত্রা উপলক্ষে পঞ্চগ্রামের চাষি মাতব্বরেরা ন্যায়রত্নের ঠাকুরবাড়িতে সমবেত হইবে। মহাগ্রামের উদ্যোক্তারা এই সুযোগে ধর্মঘটের উদ্যোগপর্বের ভূমিকাটা সারিয়া লইতে চায়। তাই বারবার দেবুকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়াছে। ন্যায়রত্ন নিজেও আবার লিখিয়াছেন—"পণ্ডিত আমার আশীর্বাদ জানিবে। ঠাকুরের রথযাত্রা, অবশ্যই আসিবে। আমাকে বিপদ হইতে ত্রাণ কর। আমার ঠাকুরের রথ চলিবে সংসার সমুদ্র পার হইয়া পরলোকে। টানাটানি করিতেছে। দায়িত্বটা তুমি লইয়া আমাকে মুক্তি দাও। তোমার হাতে ভার দিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। কারণ মানুষের সেবায় তুমি সর্বস্ব হারাইয়াছ; তোমার হাতে ঘটনাচক্রে যদি লাভের পরিবর্তে ক্ষতিও হয়—তবু সে ক্ষতিতে অমঙ্গল হইবে না বলিয়া আমার প্রত্যয় আছে।" দেবু এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারে নাই। তাই স্ত্রী-পুত্রের চিতা—চিহ্নের বিপুল আকর্ষণ, বন্ধু যতীনের বিদায়বেদনার অবসাদ—সমস্ত ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে মহাগ্রাম অভিমুখে চলিয়াছে।

ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধের উপর হইতে সে মাঠের পথে উত্তরমুখে নামিল। খানিকটা দূর গিয়াই মহাগ্রাম। ঢাকের শব্দ উচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে। পথ-চলার গতি আরও খানিকটা দ্রুততর করিয়া, জনতার ভিড় ঠেলিয়া শেষে সে ন্যায়রত্নের ঠাকুরবাড়ির আটচালায় আসিয়া উঠিল। পূজার স্থানে প্রজ্বলিত হোমবহ্নির সম্মুখে বসিয়াই ন্যায়রত্ন তাহাকে স্মিতহাস্যে সস্নেহে নীরব আহ্বান জানাইলেন।

দেবু প্রণাম করিল।

চাষি মাতব্বরেরাও দেবুকে সাগ্রহে সস্নেহে আহ্বান করিল।—এস এস, পণ্ডিত এস। এই—এই এইখানে বস। সকলেই তাহাকে বসিতে দিবার জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিয়া কাছে পাইতে চাহিল। দেবু কিন্তু সবিনয়ে হাসিয়া এক পাশেই বসিল; বলিল—এই বেশ বসেছি আমি—তবে তাহাদের আহ্বানের

আন্তরিকতা তাহার বড় ভাল লাগিল। স্ত্রী-পুত্র হারাইয়া সে যেন এ অঞ্চলের সকল মানুষের স্নেহ-প্রীতির পাত্র হইয়া উঠিল। দুই বিন্দু জল তাহার চোখের কোণে জমিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত অন্তরটা অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। মানুষের এত প্রেম!

আসিয়াছে অনেকে। মহাগ্রামের মুখ্য ব্যক্তি শিবু দাস, গোবিন্দ ঘোষ, মাখন মণ্ডল, গণেশ গোপ প্রভৃতি সকলে তো আছেন—তাহা ছাড়া শিবকালীপুরের হরেন্দ্র ঘোষাল আসিয়াছে, জগন ডাক্তারও আসিবে। দেখুড়িয়ার তিনকড়ি দাস আসিয়াছে, সঙ্গে আরও কয়েকজন; বালিয়াড়ার বৃদ্ধ কেনারাম, গোপাল ও গোকুলকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। কেনারাম সে-কালে গ্রাম্য পাঠশালায় পণ্ডিতি করিত, এখন সে বৃদ্ধ এবং অন্ধ; প্রাচীনকালের অভ্যাসবশেই বোধ করি দৃষ্টিশক্তিহীন চোখে এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত চাহিয়া দেখিল, তারপর সঙ্গী গোপালকে মৃদুস্বরে ডাকিল—গোপাল!

গোপাল পাশেই ছিল, সে বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল—পণ্ডিত, দেবু ঘোষ!

কুব্জ বৃদ্ধ সোজা হইয়া ডাকিল—দেবু? কই, দেবু কই?

দেবু আপনার স্থান হইতে উত্তর দিল—ভাল আছেন?

—এইখানে—এইখানে, আমার কাছে এস তুমি।

এ আহ্বান দেবু উপেক্ষা করিতে পারিল না, সে উঠিয়া আসিয়া বৃদ্ধের কাছে বসিয়া পায়ে হাত দিয়া স্পর্শ জানাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—প্রণাম করছি।

আপনার দুইখানি হাত দিয়া দেবুর মুখ হইতে বুক পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধ বলিল—তোমাকে দেখতেই এসেছি আমি। পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল—চোখে দেখতে পাই না, দৃষ্টি নাই, তাই তোমাকে গায়ে মুখে হাত দিয়ে বুলিয়ে দেখছি।

দেবু এই বৃদ্ধের কথার অন্তরালে যে সমবেদনা এবং প্রশংসার গাঢ় মধুর আস্বাদ অনুভব করিল, সে উচ্ছ্বাসকে এড়াইবার জন্যই প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিয়া বলিল—চোখের ছানি কাটিয়ে ফেলুন না। এই তো 'বেনাপড়ে'তে পাদ্রীদের হাসপাতালে আকছার ছানি কাটিয়ে আসছে লোকে। সত্যি সত্যিই ওখানে অপারেশন খুব ভাল হয়।

—অপারেশন? অস্ত্র করাতে বলছ?

—হ্যাঁ। সামান্য অপারেশন—হয়ে গেলেই পরিষ্কার দেখতে পাবেন।

—কী দেখব?—বৃদ্ধ অদ্ভুত হাসিয়া প্রশ্ন করিল—কী দেখব? তোমার শূন্য ঘর? তোমার চোখের জল? চোখ গিয়েছে ভালই হয়েছে দেবু। অকালমৃত্যুতে দেশ ছেয়ে গেল। সেদিন আমার একটা ভাগনে ম'ল, বোনটা বুক ফাটিয়ে কাঁদলে—কানে শুনলাম, কিন্তু তার মরা মুখ তো দেখতে হল না! এ ভাল, দেবু এ ভাল! এখন কানটা কালা হয় তো এসব আর শুনতেও হয় না।

বৃদ্ধের দৃষ্টিহীন বিস্ফারিত চোখ হইতে জলের ধারা মুখের কুঞ্চিত লোল চর্ম সিক্ত করিয়া মাটির উপর ঝড়িয়া পড়িল। ম্লান হাসিমুখে দেবু চুপ করিয়া রহিল—কোনো উত্তর দিতে পারিল না। সমবেত সকলের কথাবার্তাও বন্ধ হইয়া গেল। শুধু ন্যায়রত্নের মন্ত্রধ্বনি একটা সংগীতময় পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া উচ্চারিত হইয়া ফিরিতে লাগিল।

ঠিক এই সময়েই 'টোলবাড়ি'র আটচালার বাহিরে খোলা উঠানে রাস্তা হইতে আসিয়া উঠিল আধুনিক সুদর্শন তরুণ, দেবুরই সমবয়সী। তাহার পিছনে একটি কুলির মাথায় ছোট একটি সুটকেস ও একটি ফলের ঝুড়ি। দেবু সাগ্রহে উঠিয়া দাঁড়াইল—বিশু-ভাই!

দেবুর বিশু-ভাই—বিশ্বনাথ—ন্যায়রত্নের পৌত্র।

ন্যায়রত্নের তখন কথা বলিবার অবকাশ ছিল না, শুধু তাঁহার ঠোঁটের কোণে মন্ত্রোচ্চারণের ছেদের মধ্যে একটু সস্নেহ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

দুই

শিবকালীপুর অঞ্চলে—শিবকালীপুরেই প্রথম খাজনা-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ধর্মঘটের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

আগুন জ্বলিতেই প্রাকৃতিক নিয়মে বায়ুস্তরে প্রবাহ জাগিয়া ওঠে। শুধু তাই নয় আগুনের আশপাশের বস্তুগুলির ভিতরের দাহিকাশক্তি অগ্নির স্পর্শ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া যেন অধীর আগ্রহে কাঁপে। খড়ের চালে যখন আগুন জ্বলে, তখন পাশের ঘরের চালে খড় উত্তাপে স্ত্রীপুষ্পের গর্ভকেশরের মত ফুলিয়া বিকশিত হইয়া ওঠে। অগ্নিকণার স্পর্শ না পাইলেও—উত্তাপ গ্রাস করিতে করিতে সে চালও এক সময় দপ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে। আগুন জ্বলে, সে আগুনের উত্তাপে আশপাশের ঘরেও আগুন লাগে। তেমনিভাবেই শিবকালীপুরের ধর্মঘট চারিপাশের গ্রামেও ছড়াইয়া পড়িল। দিন কয়েকের মধ্যেই এ অঞ্চলে প্রায় সকল গ্রামেই ধুয়া উঠিল—খাজনা-বৃদ্ধি দিতে পারিব না। দিব না। কেন বৃদ্ধি? কীসের বৃদ্ধি?—অন্যদিকে শিবকালীপুরের নূতন পত্তনিদার চাষি হইতে জমিদার শ্রীহরি ঘোষও সাজিল। সে পাকা মামলাবাজ গোমস্তা, সদরের প্রধান দেওয়ানি-আইনবিদ উকিল এবং পাইক-লাঠিয়াল লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া সে ঘোষণা করিল—তাহাদের স্বপক্ষে আইনের সপ্তসিন্ধ উত্তাল হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহার অপরিমেয় অর্থশক্তি দ্বারা সেই সিন্ধু-সলিল ক্রয় করিয়া আনিয়া সে এই ক্ষুদ্রে শিবকালীপুরকে প্লাবিত করিয়া দেবে। খাজনা-বৃদ্ধির মামলা লইয়া সে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়িবে। আশপাশের জমিদারেরাও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি হইয়া উঠিল। তাহারাও শ্রীহরিকে আশ্বাস দিল।

রথযাত্রার কয়েক দিন পর।

এই কয়েকদিনের মধ্যেই ধর্মঘটের উত্তাপ গ্রীষ্মের মত ছড়াইয়া পড়িল। প্রবল বর্ষণে মাঠ ভরিয়া উঠিয়াছে। চাষের কাজ শুরু হইয়া গেল ঝপ করিয়া। রাত্রি থাকিতে চাষিরা মাঠে গিয়া পড়ে। চারিপাশের গ্রামগুলির মধ্যস্থলে মাঠের মধ্যেই কাজ করিতে করিতে ধর্মঘটের আলোচনা চলিতেছিল।

জলভরা মাঠের আইল কাটিতে কাটিতে ক্লান্ত হইয়া একবার তামাক খাইবার জন্য শিবু আসিয়া বসিল। চকমকি ঠুকিয়া শোলায় আগুন ধরাইয়া তামাক সাজিয়া বেশ জুত করিয়া বসিতেই আশপাশ হইতে কয়েকজন আসিয়া জুটিয়া গেল। কুসুমপুরের রহম শেখই প্রথমটা আরম্ভ করিল।

—চাচা, তোমরা লাগালছ শুনলাম?

শিবু দাস বিজ্ঞের মত একটু হাসিল।

এই সেদিন ন্যায়রত্নের বাড়িতে ধর্মঘট করা ঠিক হইয়াছে।

দেবু তাহাদের সব বুঝাইয়া বলিয়াছে। বাধা-বিপত্তি দুঃখ-কষ্ট অনিবার্যরূপে যাহা আসিবে, তাহার কথা সে বারবার বলিয়াছে। বিগত একশত বৎসরের মধ্যেই এই পঞ্চগ্রামে যত ধর্মঘট হইয়াছে তাহার কাহিনি শুনাইয়া জানাইয়াছে—কত চাষি জমিদারের সঙ্গে ধর্মঘটের দ্বন্দ্বে সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে। বারবার বলিয়াছে, আইন যেখানে জমিদারের স্বপক্ষে, সেখানে ‘বৃদ্ধি দিব না’ এ কথা বলা ভুল, আইন অনুসারে অন্যায়। প্রজা ও জমিদারের অর্থ-শক্তির কথা এবং আইনানুযায়ী অধিকারের কথা স্মরণ করিয়া সে প্রকারান্তরে নিষেধই করিয়াছিল।

সকলে দমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র বিশু সেখানে উপস্থিত ছিল, সে হাসিয়া বলিয়াছিল—আইন পালটায় দেবু-ভাই। আগে গভর্নমেন্টের মতে জমির মালিক ছিল জমিদার; প্রজার অধিকার ছিল শুধু চাষ-আবাদের। প্রজা কাউকে জমি বিক্রি করলে জমিদারের কাছে খারিজ দাখিল করে হুকুম নিতে হত। জমির উপর মূল্যবান গাছের অধিকারও প্রজার ছিল না। কিন্তু সে আইন পালটেছে। প্রজারা যদি ‘বৃদ্ধি দেব না’ বলে—না দেবার দাবিটাকে জোরালো করতে পারে, সঙ্গত যুক্তি দেখাতে পারে—তবে বৃদ্ধির আইন পালটাবে।

কথাটি বলিবামাত্র সমস্ত লোকের মনে একটি মাত্র যুক্তি স্ফীতকলেবর বিন্ধ্যপর্বতের মত মাথা ঠেলিয়া আকাশস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছিল—কোথা হইতে দিব? দিলে আমাদের থাকিবে কী? আমরা কী খাইয়া বাঁচি? সরকারের এমন আইন কী করিয়া ন্যায়সংগত হইতে পারে?

অন্ধ বৃদ্ধ পণ্ডিত কেনারাম হাসিয়া বলিয়াছিল—কিন্তু বিশুবাবু, মারে হরি তো রাখে কে?

বৃদ্ধের কথায় সমস্ত মজলিসটা ক্ষোভে ভরিয়া উঠিয়াছিল। জীব-জীবনের ধাতুগত প্রকৃতি অনুযায়ী একজন অপরজনকে দ্বন্দ্বে পরাভূত করিয়া শোষণ করিয়া আপনাকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তোলে। যে পরাজিত